গল্পেরা যেভাবে বেঁচে থাকে

বিষ্ণু বিশ্বাস

লেখাটি আবার তুলে রাখলেন সন্দীপন। গত তিনদিন চেষ্টা করেও শেষ করতে পারলেন না। এমনটি হওয়ার অথচ কথা নয়। নিতান্ত পাতি লেখক তো আর তিনি নন। লেখক হিসাবে তাঁর বাঙলা সাহিত্য জগতে তাঁর একটা সম্মানীয় অবস্থান আছে। প্রচুর লিখেছেন এই নাতিদীর্ঘ জীবনে। পরিশ্রম করার অপরিসীম ক্ষমতা তাঁর। কিন্তু কখনও নিজেকে শ্রান্ত নিঃশেষিত মনে হয়নি। বেগবান প্রবাহে তরী ভাসিয়েছেন নির্দ্বিগ্নে। জোয়ার ভাঁটার অনিবার্য টানে জানা অজানা কোনো ঘাটায় নিশ্চিত ভিড়বে এই প্রবল বিশ্বাসে।

লিখতে লিখতেই নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা উঠে এসেছে তাঁর কলমে। চরিত্র ও বিষয়ের বহিঃ ও অন্তর্বাস্তবের মিথস্ক্রিয়ায় পাঠককে বিমোহিত রেখেছেন প্রায় আড়াই দশককাল। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত গ্রন্থনের বাচন কিভাবে ঘাত প্রতিঘাত সঞ্জাত নিপুণতায় পৌঁছোতে পারে অন্বিষ্ট শীর্ষ বিন্দুতে সেই সৃজন প্রক্রিয়া বিস্ময় সৃষ্টি করে। তঁার সেই আশ্চর্য নির্মিতির নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়ে চিহ্নায়ক চরিত্রের কণ্ঠস্বর শেষ বিচারে সর্বজনীন অন্তর্স্বর হয়ে পাঠক মননে হীরক দ্যুতিসম বিভা বিস্তার করে।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে এইসব ভারি ভারি কথা লেখা হয়ে থাকে। সেসব থেকেই যৎসামান্য মণিমুক্তো মাত্র এখানে তুলে আনা হল। যদিও পথ চলতি ভাষায় লোকে বলে পাইকারী লেখক। আসলে ছাপার হরফ আর হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো অক্ষরের মধ্যে চিরকালীন দ্বন্দ্ব। এসব যে সন্দীপনের কানে আসে না এমনটি নয়। কিন্তু কি-ই বা আর করা যেতে পারে। পথ চলতি লোক তথা গণ-র ওপর রাগ করা যায় না। রাজনীতির লোকেরা কখনও ভোটে টোটে হেরে গিয়ে গণ-র ওপর দোষ চাপিয়ে দেন। লেখকদের পক্ষে সেটা বড়ই বেখাপ্পা ঠেকে। তাছাড়া অবিমৃষ্যকারিতাও। বরং মিটি মিটি হেসে মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। উপরন্তু কথাটি খুব বেশী মিথ্যেও তো নয়। একটি সময় শারদীয়াতে অন্যুন্য দেড় গন্ডা উপন্যাস নামিয়েছেন। ইদানিং একটু কমতির দিকে অবশ্য। হলেও যত শব্দ তাঁর কলম থেকে নির্গত হয় এখনও, তা যেকোনো অনুজ লেখকের কাছে ঈর্ষার বস্তু।

অথচ একটি পাঁচ-ছ পৃষ্ঠার গল্প লিখতে তিনদিনে সাতবার হোঁচট খেতে হল। এ তো যারা এতদিন পাইকারী লেখক বলে সুখ অনুভব করেছেন তাঁরাও লজ্জা পাবেন। আজও পারলেন না। লেখাটি ডেস্কে ঢুকিয়ে উঠে পড়লেন অস্থির মনে। আর একবার ফিল্টার খুলে জল খেলেন।

স্ত্রী মধুপর্ণা লক্ষ্য করলেন অস্থিরতা।
— তোমার ঠিক কী হয়েছে বলতো?
পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সন্দীপন।
—ক কই কিছু নাতো!
বলেই বুঝলেন জবাবটি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হল না। তাই দুচার পা হেঁটে আবার ফিরলেন স্ত্রীর দিকে।

— না তেমন কিছু নয়। ঠিকই আছে। তবে মনটা কেমন যেন — মানে কনসেনট্রেশনের একটু —

উল বুনছিলেন মধুপর্ণা। বুনতে বুনতেই একবার চোখ তুলে সন্দীপনকে দেখলেন। সেরকম কিছু নয় তবু সন্দীপনের মনে হল জরিপ করছেন।

— সেই সুনন্দা না কী যেন নাম। মেয়েদের একটা কাগজ বের করতো। তার খবর কী? অনেকদিন আর ফোন টোন করে না।

সন্দীপন বিচলিত হন না। পুনরায় পদচারনা শু করলেন।

— অমন কত কাগজ মাতৃগর্ভ থেকে বেল আর একটু কেঁদে উঠেই মায়া ত্যাগ করে চলে গেল। কত আর মনে রাখব বলো।

মধুপর্ণা ভ্রূ টানলেন। কী একটা বিশ্রী তুলনা টানলে মনটা তেতো হয়ে গেল। সুনন্দার কথা তুলতেই অত খাপ্পা হয়ে গেলে কেন? আঘাত টাঘাত পেয়েছ নাকি!তোমার যা নরম শরীর!

সুনন্দাকে সত্যিই ভুলে গিয়েছিলেন। মধুপর্ণার হেঁয়ালিতে মনে পড়ল। মধুপর্ণা কিন্তু এতদিন সুনন্দাকে মনে রেখেছেন দেখে প্রথমে অবাক তারপর কৌতুকবোধ

করলেন। মনে রাখার কারণগুলির যথার্থ বিশ্লেষন করতে গিয়ে হেসে ফেললেন এবং একটু প্রকাশ্যেই। মধুপর্ণার উলকাঁটা একটুর জন্য থেমে গিয়ে আবার যথারীতি চলতে থাকল।

বেথুয়াডহরীতে এক সভায় একবার নিয়ে গিয়েছিলেন সুনন্দা। মেয়েদের অধিকার ঃ আইনগত বনাম বাস্তবতা বা এইরকম গোছের একটি কিছু হবে — ওয়ার্কশপ ছিল। স্থানীয় মেয়েদের নিয়ে সুনন্দাই অর্গানাইজ করেছিল। কোলকাতা থেকে কিরীটিবাবুদের মতো অধিকার আন্দোলন এবং আইনি ব্যাপার স্যাপারে পোক্ত মানুষজনেরা গিয়েছিলেন। সন্দীপনের যাওয়া অবশ্য আর একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে। ঐদিনই বিকেলে ওয়ার্কশপের পর মেয়েদের একটি মুখপত্র প্রকাশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। উদ্বোধক হিসেবে সমকালীন বাঙলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক সন্দীপন রায়চৌধুরীর নাম ছিল। প্রথমে যেতে রাজী হচ্ছিলেন না। টাইট শিডিউলের মধ্যে সময় বের করাই মুশকিল। গিয়েছিলেন অবশ্য শেষ পর্যন্ত। মধুপর্ণাও যেতে বলেছিলেন। সুনন্দাকে তাঁর পছন্দ হয়েছিল খুব। বলেছিলেন মেয়েটা একটা কাজের কাজ করছে। কারণে অকারণে হিল্লি দিল্লি চলে যাচ্ছে। একটা ভালো কাজের বেলায় এত আটকাচ্ছে।

অবশেষে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন মালবিকার কথায়। বেথুয়াডহরী শুনে মালবিকা বলেছিল, ইস্ আমিও যাব তাহলে। ওখানে কী সুন্দর একটা ফরেষ্ট আছে শুনেছি। আমার পিসতুতো দাদার বন্ধু ওখানকার ডি . এফ . ও । গেষ্ট হাউসে থাকব আর নির্জনতায় —

— বাঘবাঘ রোমাঞ্চ অনুভব করব সারারাত।
হেসে ফেলেছিল মালবিকা। বেথুয়াডহরীতে বাঘ? কী যে আবোল তাবোল বলেন।
— কত রকমের বাঘ আছে জান? সব বাঘই কি আর হালুম হুলুম করে? নিঃশব্দে কাজ সারে। কখন তোমাকে চেটেপুটে খেয়ে নেবে টেরটিও পাবে না।

সকাল ৭-৫০ -এ লালগোলায় যাওয়া স্থির হয়েছিল। সুনন্দা সেইরকমই বলে দিয়েছিল। মধুপর্ণাও তাই জানতেন। যদিও গিয়েছিলেন মালবিকার নতুন কেনা কনটেসায়। দীর্ঘপথ যাত্রার ধকলটাও অনেকটাও কমেছিল। একে এসি তায় মালবিকার মত সঙ্গিনী। বেশ লাগছিল সন্দীপনের।

প্রোগ্রাম বেশ ছিমছাম। সন্দীপন সুন্দর একখানি বক্তৃতা রাখলেন। এ ধরনের কাজের উপযোগিতা আর গুত্বের উপর জোর দিয়ে পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কমনা করলেন এবং উদ্যোক্তাদের বারংবার ধন্যবাদ জানালেন। সুনন্দারা রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেছিল। কিরীটিবাবুরা থেকে গেলেন। জরী কাজ আছে বলে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন সন্দীপন। ফরেষ্ট গেষ্ট হাউসে দুটি ঘর বুক করা ছিল দুজনের নামে। সেখানেই রাত্রিযাপন।

পরদিন কলকাতায় ফিরে মধুপর্ণাকে বলেছিলেন সন্দীপন। ফরেষ্টে নিশিযাপনের রোমাঞ্চ। আশ্চর্য নির্জনতা। নির্মল আকাশে ধবকধবক করা কালপুষ। শুধু মধুপর্ণাকে খুব মিস্ করেছিলেন। ব্যাস এইটুকুই। সব শুনেটুনে মধুপর্ণা মজা করেছিলেন — তো সুনন্দাকে একটা প্রস্তাব দিয়ে দেখতে পারতে। সন্দীপন শব্দ করে হেসেছিলেন তখন। সুনন্দাকে ভেবেই মধুপর্ণার কৌতুক। নিঃসংশয় যে মালবিকার কথা জানলে এ কৌতুক আসত না। তাই হেসেছিলেন সেদিন। আজ দ্বিতীয়বার হাসলেন।

মধুপর্ণা আবার মগ্ন হলেন উলবোনায়। সন্দীপন আবার হাঁটছেন। অস্থির। তরঙ্গ খেলছে মস্তিষ্কের বালুকাবেলায়। স্থিত হতে পারছেন না। কতকটা জোর করেই সুনন্দাকে নিয়ে ভাবতে বসলেন। আচ্ছা সুনন্দা কি এখনও কাগজখানি চালায়? কি যেন নাম মনে করতে পারলেন না। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার উদ্বোধন করেছিলেন তিনি। সেই বেথুয়াডহরীতে। কত বছর আগের কথা মনে মনে একটি হিসাব কষে বের করার চেষ্টা করলেন। তসলিমা নাসরিন তখনও এসে পড়েননি। অপর্না সেনের পরমা তখন রিলিজ হয়েছে। মানে আটের দশকের মাঝামাঝি আর কি। মেয়েদের অধিকার বিষয়ক কাগজ। সামান্য দুফর্মার — লেটার প্রেসে ছাপা। যদিও যুক্তি আর শক্তিতে ঘাটতি ছিল না। প্রথম সংখ্যাটি ভালোই লেগেছিল। তবুও চলল না তেমনভাবে। বাজারে ততদিনে ঝকঝকে মলাটের অফসেটে ছাপা রঙ্গীন 'মেয়েদের একমাত্র মাসিক পত্রিকা' দখল নিয়ে নিয়েছে। রূপচর্চা, গৃহসজ্জা, সেলিব্রিটির প্রথম প্রেমের সরস আখ্যান, উটি কিংবা হাওয়াই দ্বীপে নিদ্বিগ্নে হনিমুন যাপনের সুলুকসন্ধান, চিত্রতারকাদের বিবাহিত জীবনের নানান ইয়ে ও ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তৎসঙ্গে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে নারী অবদমন ও অত্যাচারের সত্যঘটনা, দুষ্টু জনের ভাষায় ধর্ষণ বিষয়ক সত্য কাহানিয়া। সুনন্দাদের দুফর্মা ক্রমশই চাপা পড়তে থাকল মেয়েদের এই একমাত্র মাসিক পত্রিকার টনটন ওজনে। সুনন্দা তখন একটি লেখার জন্য বেশ কয়েকবার এসেছিল। দেব দেব করেও শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারেন নি। যদিও একমাত্র মাসিকের জন্য দু-চারটে লেখা তখন লিখতে হয়েছিল। অনেক কিছুই যেমন করতে হয় সেরকম আর কি। সে যাকগে। সুনন্দাদের কাগজ এভাবেই ষ্টল থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে থাকল। হারিয়ে গেল। তারপর কি হয়েছে জানেন না সন্দীপন। এভাবেই এত কিছু হারিয়ে গেছে। হারায়। দীপ এভাবেই হারিয়েছে।

— একটা গল্প কিছুতেই শেষ করতে পারছি না।
মধুপর্ণা ভাবান্তর দেখালেন না।
— গল্পটা একটা প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। শেষ করতে পারছি না। আজ তিনদিন শুধু —
উলকাঁটা থামিয়ে চোখ তুললেন মধুপর্ণা।

— সে আবার কী? শেষ করতে পারছনা মানে? তিনদিন শুধু শুধু — কোন কাগজে লিখছ যে এত —
একটি গল্পের শেষাংশ। তিনদিন ধরে পারছেন না। না তিনদিন নয়। আজ একত্রিশ বছর গল্পটি তার কাছে আছে। শেষ টুকু ছাড়া। গল্পটি প্রাচীরের সামনে এসে দাড়িয়ে গেছে। বের হবার পথের হন্য সন্ধানে সন্দীপন। আজ তিনদিন।

আসলে গল্পটি তাঁর নয়। গল্পটি দীপের। উনিশ বছরের দীপ। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বসে লিখেছিল। একত্রিশ বছর আগে। দীপ তারপর হারিয়ে যায়। অসমাপ্ত গল্পটি এতদিন তার কাছে ছিল। দীপ আর কোনদিনই ফিরে আসবে না । তিনি জানেন।

একত্রিশ বছর ব্যবধানে দীপের সেই গল্প লিখছেন তিনি। দীপ যেখানে শেষ করেছিল সেখানে পৌছতে পারছেন না। একই বিন্দুতে বারবার ফিরে আসছেন। ফিরে আসছেন। ফিরে আসছেন। আবার ফিরে আসছেন। একটি প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে গল্প। তিনদিনে সাতবার চেষ্টা করে ধৈর্য হারালেন সন্দীপন।

ঠিক এসময়ে সুনন্দার প্রসঙ্গ তুললেন মধুপর্ণা।
— সেই সুনন্দা না কী যেন নাম। মেয়েদের একটা কাগজ বের করত। তার খবর কি?
সত্যি কতদিন সুনন্দাদের খবর নেওয়া হয়নি। পুরোনো ডায়রীর পাতা খুলে ফোন নম্বর পাওয়া গেল। ফোন করতেই এক্সচেঞ্জ থেকে বলল পুরোনো নাম্বারের আগে একটি পাঁচ জুড়ে দিতে।

তিনবারের চেষ্টায় সুনন্দাকে পাওয়া গেল।
— সন্দীপন রায়চৌধুরী। চিনতে পারছো?
টেলিফোনেই হাসল সুনন্দা। এত রাতে?
— তিনবার ফোন করেছি। তোমাকে তো ধরাই মুশকিল।
— বেলুড় শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প নিয়ে একটা সভা ছিল। ওখানেই দেরী হল।
— আগে তো মহিলা সংগঠন করতে। এখন আরো অনেক বিষয়ে দেখছি —
শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে তো মহিলারাও পড়েন সন্দীপনদা। প্রায় অর্ধেক বলা যায়।
— রাইট। আচ্ছা তোমাদের সেই কাগজের খবর কি? অনেকদিন দেখিটেখি না।
— চলছে । ভালই। সার্কুলেশন এখন অনেক বেড়েছে। হাওড়ার মনশ্রীতে একটি মহিলা সংগঠন দেড়শো মতো নিচ্ছে। নদীয়ার দত্তপুলিয়ায় আগে একশ যেত। এবছর থেকে আরো পঞ্চাশ বাড়িয়েছে। সজনেখালিতে পঁচাত্তর কপি বাঁধা। বেথুয়ার কথা মনে আছে আপনার? ওরা পঞ্চাশ নেয় আগাগোড়াই । পলাশীপাড়ার বিকাশ, ঝিজিৎরা পঁচিশ কপি নেয়। এছাড়া খুচখাচ কিছুতো আছেই। শ্রীরামপুরে শর্মিলাদি, নৈহাটীতে বঙ্কিমদা এরাও কিন্তু কিছু নেয়। উত্তরবঙ্গ থেকেও অনেকে চাইছে। আমরাই ঠিকঠাক পাঠাতে পারছি না। আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি। তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই।

— ওঃ আচ্ছা। অনেকদিন তোমাদের সাথে যোগাযোগ নেই তাই —
— আসুন না, সামনের বুধবার শেওড়াফুলিতে। যৌনকর্মীদের জন্য একটা স্বাস্থ্য পরিসেবা কেন্দ্র চালু হবে। দুর্বার মহিলা সংগঠন থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আসছেন তো?

— আচ্ছা দেখি। সামনের বুধবার তো! ফোন করে জানাবো।
সুনন্দা এখনো লেগে আছে। কাগজটা ভালই চালাচ্ছে তাহলে। সন্দীপন ভেবেছিলেন কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে। ছোটবেলায় একবার শ্যামলেন্দুস্যার বলেছিলেন, কিছুই হারায়না —দৃষ্টি সরে যায় কেবল। কথাটি এতদিন বাদে আবার মনে পড়ল। সুনন্দাদের খোঁজ রাখতে পারেননি। দৃষ্টি সরে গিয়েছিল। এভাবেই আসলে হারায় সবকিছু।

দীপও তাহলে সত্যি সত্যি হারায়নি। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে আর ফিরে আসেনি সে। ফিরবে না কোনদিন। যেমন ফেরেননি বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে তিমিরবরণ, ভাগলপুর থেকে মুরারী, হাওড়া থেকে প্রবীর, কিংবা হুগলী জেল থেকে দ্রোণাচার্য ঘোষ। কতদিন আগে লেখা মৃদুল দাশগুপ্তর লাইনটি ঠান্ডা বাতাসের মতো স্পর্শ দিয়ে গেল, ‘ সোনার টুকরো ছেলে দ্রোণাচার্য ঘোষ’।

— কী বলল সুনন্দা? আবার কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে মনে হল। বেথুয়াডহরী নাকি? তারপর সেই ফরেষ্ট বাংলো। নির্জন নিশুতিরাত। স্ত্রীকে রেখে এসেছো দেড়শ কিমি দূরে। পাশের ঘরেই একজন। হাত বাড়ালেই যাকে —। অথচ তুমি তারা দেখছো আকাশের। কালপুষ, সপ্তর্ষিমন্ডল।

সন্দীপন কিছু বললেন না।
মশারির চারদিক গুঁজতে গুঁজতে মধুপর্ণা বললেন —
আরে যাও যাও। বড্ড বোর হচ্ছ তুমি। আগামী পুজোর উপন্যাসের রসদ পেয়ে যাবে।
উনিশ বছরের দীপকে খুঁজছে সন্দীপন । সেই দীপ। উনিশের তাণ্য। শ্যামলা রঙ। বড় চোখ। রোগা শরীর। অসম্ভব দ্রুত কথা বলত। আরো দ্রুত চলাফেরা। সকালে কৃষ্ণনগর, বিকেলে বারাসাত। পরদিন ডেবরা গোপীবল্লভপুর। রাতের অন্ধকার হাওড়ায় নেমে চুপিসাড়ে বরানগর-কাশীপুর গোপন ডেরায়। একাত্তরে অন্নট। একটির পর একটির দুর্গের পতন। পালিয়ে বেড়ানো। দেওয়ালে ঠেকে যাওয়া পিঠ। শেষ আশ্রয় আলিপুর সেন্ট্রাল।

গল্পের নায়ক প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানেই দাঁড়িয়ে গেছেন সন্দীপন। চওড়া উঁচু প্রাচীর পথদ্ধ করে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে জেলের ওয়ার্ডার আর রক্ষীদের মধ্যে চাঞ্চল্য। পাগলাঘন্টি বাজার পূর্বমুহুর্ত। এখানেই থেমে ছিল গল্প। থমকে গেছে সন্দীপন।

দীপ কিন্তু জেল ব্রেক করেনি। ব্রেক করে জনতার মাঝে মিশে যায়নি। কিংবা জেলের ভিতরেই শহীদ হয়ে যায়নি তিমির মুরারী প্রবীর দ্রোণাচার্যের মত। শুধু জেল থেকে হারিয়ে যায় দীপ। সন্দীপন সংশোধন করলেন — কিছুই হারায়না, দৃষ্টি থেকে সরে যায় কেবল। দীপ সরে গেল দৃষ্টি থেকে।

অন্তরালে তার শ্যামলারঙ উজ্জ্বলতর ক্রমশ। ভাঙা গালে লাগল মাংসের পু আস্তরণ। ঘাড়ে গর্দানে বাড়তি চর্বির অতিরিক্ত সেফগার্ড। খুব বেশী ঘুণ চক্কর না খেয়ে সরাসরি তরী ভিড়াল সফলতম বাণিজ্যিক পত্রিকার সিঁড়ি লাগানো ঘাটায়। অতঃপর পিছন ফিরতে হয়নি আর। শারদীয়ার হেবিব ডিমান্ড। এক থেকে দেড় গন্ডা ঢাউস নভেল নামানো — যেগুলি পরে নামী প্রকাশন থেকে ইট সাসজ হয়ে দমিতকাম মধ্যবয়স্কার চমৎকার অনিদ্রাহরণ কিংবা বুক কেসে একেবারে খাপে খাপ। ত

ার মধ্যে অন্ততঃ ,কখানি চিত্রপরিচালক গজানন সাহার হাতে পড়ে যাকে বলে সুপার ডুপার। পাঁচ ছ পাতার গল্প তো নস্যির এক টিপ।

তারপর ! তারপর পাগলা ঘন্টি বেজেছিল। হিউম্যান ল্যাডারের সাহায্যে নায়ক তখন প্রাচীরের ওপর। একদিকে মুক্তি, উদ্বেল সঙ্গীসাথী, মুক্তজীবন — নতুন করে শু করা। বিপরীতে জেলের ভিতরে অসহায় ল্যাডার। যা তাকে পৌছে দিয়েছে মুক্তির সর্বোচ্চ শিখরে। তখনই বেজে উঠেছিল পাগলা ঘন্টি। অর্থ যার নির্বিচার বেয়োনেট চার্জ। অসম লড়াই। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া। সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে। পালিয়ে যায়নি নায়ক। নেমে এসেছিল ল্যাডার বেয়ে। এক দুঃসাহসী অসম লড়াই-এ। যেমন এক অসম লড়াই মাটি আঁকড়ে লড়ে যাচ্ছে সুনন্দা। সুনন্দারা এখনও। মানশ্রীতে, বেথুয়ায়, সজনেখালি, বেলুড়ে। শ্যাওড়াফুলি, দত্তপুলিয়ায়। পলাশীপাড়াতে।

মনে পড়ে যাচ্ছে সন্দীপনের। গল্পের শেষটুকু। একত্রিশ বছর ধরে আগলে রাখা গল্প। 'পালাবার পথে ধুলো ওড়ানোর দঙ্গলে ভাই আমিও ছিলাম।' যারা ছিল না তাদের উত্তরসুরীদের হাতে তুলে দেবার জন্য এ গল্প।

দ্রুত লেখার টেবিলে ফিরে এলেন সন্দীপন। মশারীর মধ্যে গায়ে মুখে স্কিন মিল্ক মাখতে মাখতে মধুপর্ণা মললেন, এখনই না লিখলে চলছিল না।

— সুনন্দাদের কাগজের নেকস্ট্ ইস্যুতে গল্পটা দিতে হবে।
— যাক। শেষ পর্যন্ত সুনন্দাকে একটা লেখা দিলে তাহলে। অনেক ঘুরিয়েছে যাহোক। বয়ে এনে গল্পটা যথাস্থানে পৌছে দিতে পারলাম তাহলে।

— কী বলছো এসবের মাথামুন্ডু কিছুই—
সন্দীপনের গলায় এক আশ্চর্য দূরত্ব।
—গল্পটা তো আমার নয়। দীপের। দীপের গল্প আমার কাছে জমা ছিল এতদিন। একত্রিশ বছর। শেষটুকু হারিয়ে ফেলেছিলাম। এতদিনে তাকে উদ্ধার করেছি। এখন আমি— আমি এখন — আমি — এখন —

শেষ করতে পারলেন না কথাটি। একথার কোনো শেষ হয়না। শেষ নেই।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com